৭

ঈশ্বরের অবিশ্বাস সম্পর্কে যুক্তি*

Proofs for the existence of God

[ঈশ্বরে অবিশ্বাস সম্পর্কে যুক্তি : (ক) দুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি (খ) ফ্রয়েডের মতবাদ, (গ) চার্বাক, (ঘ) বৌদ্ধ ও (ঙ) জৈন মতবাদ। [Grounds for disbelief in God : (a) Sociological theory (Durkheim), (b) Freudian theory, (c) Cārvāka, (d) Bauddha and (e) Jaina view.]

৭.১. (ক) দুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি (*Durkheim's Sociological agrument*)

নরমপন্থী সংশয়বাদীগণ, প্রত্যক্ষবাদী, অজ্ঞেয়বাদী অথবা নাস্তিকতাবাদী, যাই হোক না কেন তাঁরা সকলে মানেন যে মানুষের ধর্ম আছে, ধর্মীয়ভাব আছে এবং ধর্মীয় মানুষের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাঁরা শুধু একথাই বলেন যে, এইসব ভাব বা বিশ্বাসের ব্যাখ্যার জন্য অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না, প্রাকৃত সমাজের নিয়মেই তাদের ব্যাখ্যা সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুরখেইম (Emil Durkheim) ধর্ম তথা ধর্মের ঈশ্বর প্রসঙ্গে এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

দুরখেইমের মতে, ধর্মের ঈশ্বর, মানুষ যাকে পূজার্চনা করে, তা হল মানুষের অবচেতনে এক কল্পিত সত্তা, যে সত্তাকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার ক'রে সমাজ তার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে অনুগত করে, তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্মীয়ভাবাপন্ন মানুষ যখন অতিপ্রাকৃত, অতিমানবীয় শক্তিকে তার চারপাশের জগতে অনুভব ক'রে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে অত্যাবশ্যকীয়রূপে গণ্য করে, তখন আসলে সে তার চারপাশের **সমাজের অনমনীয় শক্তিকেই** অনুভব ক'রে তার প্রতি শ্রদ্ধা-বিস্ময়-জড়িত আনুগত্য জ্ঞাপন করে। ধর্মের ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে কোন অতিপ্রাকৃত সত্তা নয়, তা হল চারপাশের প্রাকৃত পরিবেশ অর্থাৎ সমাজ। ধর্মের ঈশ্বর ও ঈশ্বর-শক্তি তাই সমাজ ও সমাজ-শক্তির প্রতীক ভিন্ন অন্য কিছু নয়। **ঈশ্বর-কল্পনা মানুষের এক অতি-কল্পনা, ঈশ্বর আসলে সমাজের প্রতীক স্বরূপ এক শক্তি—সমাজশক্তি।** সমাজই কল্পিত ঈশ্বর—সমাজশক্তিই ঈশ্বর-শক্তি। 'সব ধর্মের অন্তঃসার হল এমন এক রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাস যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে এবং এই শক্তির ধারণার মূলে হল সমাজস্থ ব্যক্তির প্রতি সমাজের কর্তৃত্ব বা অভিভাবকত্ব'।[১] কাজেই **ধর্মের ঈশ্বর আসলে সমাজশক্তির প্রতীক।** ধর্মের ঈশ্বর যা প্রতীকায়িত করে তা আসলে গোষ্ঠী সমাজের রীতি, নীতি, আচার, প্রথা ইত্যাদি। গোষ্ঠীসমাজভুক্ত মানুষের আসল ঈশ্বর হল সমাজই—যে রহস্যময় শক্তিকে সে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে চলেছে আসলে তা অপ্রতিরোধ্য সমাজশক্তি।

বিশেষ করে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের গোষ্ঠী-সমাজকে (tribe) আলোচ্য বিষয় করে দুরখেইম এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন। গোষ্ঠীর (tribe) আকার অতি ক্ষুদ্র—কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে হল এক একটি গোষ্ঠী। একাধিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ বা গোষ্ঠী-সমাজ, মিত্রভাবে বা শত্রুভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রতিটি

১. 'The substratum of all religious belief lies in the idea of a mysterious impersonal force controlling life, and this sense of force is derived from the authority of society over the individual.' The Philosophy of Religion. D. Mial Edwards P. 4.

গোষ্ঠী-সমাজ আকারে ক্ষুদ্র হলেও অতিশয় সংগঠিত। এপ্রকার **গোষ্ঠী সমাজে সমাজটাই মুখ্য, ব্যক্তি নেহাৎই গৌণ।** ব্যক্তির কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, স্বাধীন ইচ্ছা নেই—গোষ্ঠীর ইচ্ছাই ব্যক্তির ইচ্ছা, গোষ্ঠীসম্মত জীবন-যাত্রাই ব্যক্তির জীবনযাত্রা। ফ্রয়েড তাঁর সুবিখ্যাত 'টোটেম এণ্ড ট্যাবু' গ্রন্থে (Totem and Taboo) ব্যক্তির প্রতি গোষ্ঠী-সমাজের অপ্রতিরোধ্য অনুশাসনের একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন* যেখানে গোষ্ঠী-সম্মত বিধিগুলিকে অনুসরণ করতে ব্যক্তি বাধ্য থাকে এবং গোষ্ঠীসম্মত নিষেধগুলিকে অনুসরণ না করতে ব্যক্তি বাধ্য থাকে।

মেলানেসিয়া (Melanesia), নিউ ক্যালেডোনিয়া (New Caledonia) প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলের উপজাতি সমাজে মাতা এবং পুত্রের মধ্যে, ভ্রাতা এবং ভগিনীর মধ্যে যৌনাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করার জন্য কতকগুলি অবশ্য পালনীয় বিধি ও নিষেধের প্রচলন আছে। কৈশোর সমাগমে পুত্র-সন্তানকে গৃহে লালন-পালন নিষিদ্ধ, তাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের জন্য club-house-এ বা পরিচর্যা কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। কৈশোর অতিক্রান্ত হলে ভ্রাতার সঙ্গে ভগিনীর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। পথ চলা কালে কখনো যদি ভগিনী দেখে যে ভ্রাতা সেই একই পথে অনুগমন করছে তাহলে ভগিনীকে একটি পথ-পার্শ্বে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করতে হবে। পথ চলা কালে ভ্রাতা যদি কখনো সেই পথে ভগিনীর পদচিহ্ন দেখতে পায় তাহলে তাকে সেই পথ পরিত্যাগপূর্বক ভিন্ন পথে গন্তব্যস্থলে যেতে হবে। ভ্রাতা যদি কখনো কিছু খাবার জন্য মাতৃগৃহে যাবার ইচ্ছা করে, তাহলে পূর্বেই সেই ইচ্ছা কোনভাবে মাতাকে জানাতে হবে। মাতৃগৃহে আসার পর গৃহমধ্যে পুত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং মাতার মুখোমুখি হওয়াও নিষিদ্ধ। মাতা একটি পর্দার আড়ালে থেকে গৃহের বাইরে দণ্ডায়মান পুত্রকে আলগোছে (অর্থাৎ সংস্পর্শ বাঁচিয়ে) খাদ্যবস্তু পরিবেশন করবেন। এইসব নিষেধ অমান্য করলে সমাজ ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেয়—কখনো মৃত্যুদণ্ড, কখনো বা সমাজচ্যুত করা, যার পরিণামও মৃত্যু। তেমনি আবার আদিবাসী গোষ্ঠী সমাজে খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কেও কতকগুলি বিধি-নিষেধ আছে—কোন্ কোন্ খাদ্য গ্রহণীয় এবং কোন্ কোন্ খাদ্য বর্জনীয়। এসব নিষেধ অমান্য করলে সমাজ ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেয়। এমনকি অজ্ঞাতে নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করলে, সমাজের ধ্যান-ধারণা অনুসারে, ব্যক্তিকে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হতে হয়। ফ্রয়েড এমন একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।** আদিবাসী গোষ্ঠী-সমাজের এক নিরীহ ও নিরপরাধ ব্যক্তি অজ্ঞাতে একদিন সমাজ-নির্দেশিত নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ার পর সমাজের বিধান লঙ্ঘন করার জন্য অনুশোচনায় অবসাদগ্রস্ত হয়ে এবং অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়ে অশেষ ভোগান্তির পর মৃত্যু বরণ করে।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, আদিবাসী গোষ্ঠী-সমাজে সমাজ তার অপ্রতিরোধ্য রহস্যময় শক্তির দ্বারা ব্যক্তির জীবনকে সর্বব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ আদিম মানব সমাজে সমাজ ও সমাজশক্তিই সব, সমাজ অতিরিক্তভাবে ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। 'সমাজ-আরোপিত জটিল আচার-বিচার বা বিধি-নিষেধের দ্বারা ব্যক্তির জীবন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত—যে-কোন বিধি লঙ্ঘনের পরিণাম কঠোর শাস্তি।'[১] ব্যক্তি যেন সমাজের আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। 'আদিম মানুষের গোষ্ঠী-সমাজ যেন এক জীবন্ত দেহ এবং ব্যক্তি যেন দেহ-কোষ (cell), গোষ্ঠী-সমাজের বা সমাজ-মনের বাইরে ব্যক্তির বা ব্যক্তি মনের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই'।[২]

সমাজের এই সর্বময় 'প্রভুত্ব-শক্তির সঙ্গে' মানুষ ক্রমশই 'ন্যায়পরায়ণতা', 'পবিত্রতা' ইত্যাদি, মানবিক গুণ যুক্ত ক'রে মনে করে যে সমাজশক্তি অপ্রতিরোধ্য হলেও তা ব্যক্তির জীবনে মঙ্গল-প্রদায়ক। মানুষ মনে করে যে, সমাজ তার প্রথার মাধ্যমে, আচার-বিচারের মাধ্যমে, বিধি-নিষেধের মাধ্যমে, ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ

* Totem and Taboo—Freud. S. P. 10.

** Ibid. P. 21.

১. 'The individual is in the grip of a complicated and rigidly enforced system of social custom and....any infringement of tribal custom is apt to be visited by terrible punishment'. Philosophy of Religion. M. Edwards. P. 95.

২. 'The tribe or clan was a psychic organism within which the human members lived as cells, not yet fully separated out as individuals from the group mind. Philosophy of Religion. John H. Hick. P. 31.

সাধন ক'রে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক জীব, সমাজের মধ্যে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার মধ্যেই তার আনন্দ—সমাজের বাইরে থাকে নিঃসঙ্গতা, যা মানুষের জীবনকে করে অসুখী, নিরানন্দময়। সমাজের মধ্যে থেকেই খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি লাভ ক'রে মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি সংগ্রহ করে। কাজেই সমাজ ও সমাজশক্তি ব্যক্তির জীবনে অমঙ্গলজনক নয় এবং সেজন্য সেই 'ন্যায়পরায়ণ' ও 'পবিত্র' শক্তির প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রদর্শন মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। —**সমাজশক্তি সম্পর্কে এপ্রকার ধারণা থেকেই, দুরখেইমের মতে, আদিম সমাজের মানুষের মনে মঙ্গলময় ঈশ্বরের ধারণাটির উদ্ভব হয় এবং সেই ধারণাটিকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার ক'রে সমাজ ব্যক্তি-মানুষের আনুগত্য আদায় করে।** আদিম গোষ্ঠী-সমাজের মানুষ আরও মনে করে যে, তার সমাজের আদি নেই—তার (ব্যক্তি মানুষের) জন্মের আগে সমাজ ছিল এবং তার (ব্যক্তি মানুষের) মৃত্যুর পরেও সমাজ থাকবে। কল্পিত ঈশ্বরের প্রতি মানুষ এই দুটি বৈশিষ্ট্যও প্রয়োগ ক'রে মনে করে যে, ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত—ঈশ্বর কোন এক কালে এই জগৎকে এবং জগতের মানুষ তথা জীবজন্তুকে সৃষ্টি করেছেন ; ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পালক এবং সংহারক।

দুরখেইমের মতে, ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের এ-প্রকার কল্পনার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, এ-হল আদিম সমাজের আদিম মানুষের এক অতি-কল্পনা। এমন অতি-কল্পনার মূলে হল, তৎকালীন সমাজ ও সমাজশক্তি সম্পর্কে মানুষের ধারণা। মানুষ তার চারপাশের জগতে এক অলঙ্ঘনীয় কিন্তু মঙ্গলজনক সমাজশক্তিকে উপলব্ধি ক'রে সেই শক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করে এবং সমাজের নির্দেশকে ঈশ্বরের নির্দেশরূপে গণ্য ক'রে সমাজের প্রতি সে তার আনুগত্য প্রদর্শন করে। অর্থাৎ ধর্মকে এবং ধর্মের ঈশ্বরকে একটি মাধ্যম বা হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে আদিবাসীদের গোষ্ঠী-সমাজ সমাজস্থ ব্যক্তিদের আনুগত্য আদায় করে। **ঈশ্বর তাই সমাজশক্তির প্রতীক মাত্র, সমাজশক্তি-অতিরিক্তভাবে ঈশ্বরের শক্তির কোন অস্তিত্ব নেই।** তাহলে, 'ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন' ধর্মীয় এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করে এমন কথাই বলতে হয় যে, "নিজ সমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার-বিচার ইত্যাদিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে"।[১]

সমালোচনা (*Criticism*)

দুরখেইম এবং অপরাপর ফরাসী সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসরণ করে এমন বলার মধ্যে কোন দোষ নেই যে, বাস্তবিকপক্ষে ধর্ম এক সামাজিক ঘটনা এবং ধর্মের ঈশ্বর এক সামাজিক প্রত্যয়। তবে দুরখেইম এবং অপরাপর সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসরণ করে এমন বলা সঙ্গত হবে না যে, 'ধর্ম' এবং 'ধর্মের ঈশ্বর' একপ্রকার হাতিয়ার যা প্রয়োগ করে সমাজ তার ব্যক্তিবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের অনুগত করে।'

'ধর্ম এক সামাজিক ঘটনা এবং ঈশ্বর নিছক সমাজ-শক্তির প্রতীক' দুরখেইমের এমন অভিমতের বিরুদ্ধে ধার্মিক ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত অভিযোগগুলি উত্থাপন করেন —

(১) ধর্মকে (বা ধর্মের ঈশ্বরকে) সমাজের বা সমাজশক্তির প্রতীকরূপে গণ্য করলে **সার্বিক ধর্ম চেতনাকে** (universal religious consciousness) ব্যাখ্যা করা যাবে না। আদিম সমাজ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-সমাজ, যেখানে এক সমাজের আশে পাশে অপরাপর গোষ্ঠী- সমাজও মিত্রভাবে বা শত্রুভাবে বিদ্যমান ছিল, এবং যেখানে এসব সমাজের আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বা মিল ছিল না, পরন্তু লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। কিন্তু মানুষের ধর্মচেতনা বা ধর্মীয়ভাব বিশেষ কোন গোষ্ঠী সমাজের ক্ষুদ্র আবেষ্টনীতে আবদ্ধ ছিল না, তা এক সমাজের গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠী সমাজের আচার-বিচার, ধ্যান-ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সেইসব সমাজের সভ্যদের সঙ্গে সর্বদা সৌহার্দ্যের অথবা ভ্রাতৃত্বের নিগূঢ় বন্ধন ছিল না, বরঞ্চ শত্রুতা ভাব ছিল। কিন্তু ধর্ম ক্রমশই বিভিন্ন গোষ্ঠী-সমাজে সম্প্রসারিত হওয়ায় এবং একেশ্বরের ধারণাটি উন্মেষিত হওয়ায় তা বিভিন্ন গোষ্ঠী সমাজের সভ্যদের এক নিগূঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে, কেননা একেশ্বরবাদে একথাই বলা হয় যে, প্রেমময় ঈশ্বরের

১. '.....it is....the human animal who has created God in order to preserve its own socials existence' Ibid. P. 31.

কাছে সব সমাজের সব মানুষ সমান ভালবাসার পাত্র, এবং সেজন্য মানুষ যদি তার সমাজের অথবা অন্য সমাজের মানুষকে ভ্রাতা অথবা ভগিনীরূপে ভালবাসে তাহলে সেটাই হবে উত্তম ধর্মনিষ্ঠা—সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ভক্তি বা ঈশ্বর পূজা। এভাবে **সমাজশক্তির পরিসর এবং ঈশ্বর-শক্তির পরিসর অভিন্ন না হওয়ায় ধর্মের ঈশ্বরকে সমাজ-শক্তির প্রতীকরূপে গণ্য করা যাবে না।** এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হিক (Hick) বলেন, 'ধর্মের ঈশ্বর যদি সমাজশক্তির প্রতীক হয়, ঈশ্বরের অনুজ্ঞা যদি কেবলমাত্র সমাজের অনুজ্ঞারূপে বিশেষ এক গোষ্ঠী-সমাজের মানুষের প্রতি সেই গোষ্ঠীর স্বার্থসাধনের উদ্দেশে আরোপিত হয়, তাহলে সেই অনুজ্ঞা সব গোষ্ঠী-সমাজের সব মানুষ অনুসরণ করতে দায়বদ্ধ হবে কেন'[২] ? দুরখেইম প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকগণ 'সমাজ' শব্দটিকে যে (সংকীর্ণ) অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেই অর্থে সমগ্র মানবজাতিকে (human race) 'সমাজ' বলা চলে না। কাজেই সমাজের নির্দেশকে ঈশ্বরের নির্দেশরূপে অথবা ঈশ্বরের নির্দেশকে সমাজের নির্দেশরূপে গণ্য করা চলে না।

(২) দুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলে **সামাজিক অগ্রগতি বা সমাজ-সংস্কারকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।** সাধারণভাবে সমাজ এক রক্ষণশীল (conservative) সংগঠন, সমাজে প্রচলিত আচার-বিচারগুলি, ধ্যান ধারণাগুলি সমাজের পক্ষে মূল্যবান, হিতকর এবং উপযোগী—এমন মনে করে সমাজ তাদের রক্ষণ করতে আগ্রহী থাকে, পরিবর্তন সাধন সমাজের অভিপ্রেত নয়। পক্ষান্তরে যুগপ্রবর্তক ধার্মিক ও নীতিনিষ্ঠ মহাপুরুষগণ পরিবর্তনপন্থী। ধর্মের জগতে, নৈতিক জগতে, পরিবর্তন সাধনের জন্য, ধর্মের, নৈতিকতার, অগ্রগতিকে সম্ভব করার জন্য, দেখা যায় যে, এইসব ধর্মীয় মহাপুরুষগণ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে সমাজের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সমাজের আচার-বিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং সমজস্থ মানুষও উন্নত ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনলাভের জন্য সমাজে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এভাবেই যুগে যুগে সমাজের সংস্কার সাধন, অগ্রগতি-সাধন সম্ভব হয়েছে। কাজেই, দুরখেইমকে অনুসরণ করে পরিবর্তন-বিরোধী সমাজের সঙ্গে পরিবর্তনকামী ধর্মকে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত হবে না এবং এমন বলাও সঙ্গত হবে না যে, সমাজশক্তির প্রতীক হল ধর্মের ঈশ্বর।

(৩) দুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদে **নীতিনিষ্ঠ ধর্মগুরুদের নৈতিককর্মাদির ব্যাখ্যা হয় না।** যুগপ্রবর্তক নীতিনিষ্ঠ ধর্মগুরুরা সমাজের প্রচলিত নৈতিক ভাল-মন্দের নৈতিক ধারণাগুলিকে অকেজো ও অযথার্থরূপে নাকচ ক'রে নতুন নতুন নৈতিক ধারণা প্রবর্তন করেন এবং তাঁর অনুগতদের বলেন যে, সেইসব অভিনব নৈতিক ধ্যান-ধারণা অনুসরণ করতে মানুষ মাত্রই দায়বদ্ধ। আদিম গোষ্ঠী-সমাজে যখন অহরহ গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে মানুষের জীবন ছিল বিপর্যস্ত, সেখানে জীবনের সুরক্ষা, জীবনকে দীর্ঘায়িত করা এবং দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যই ছিল মানুষের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে যা সহায়ক তাকেই গোষ্ঠী সমাজে ভালরূপে এবং যা অন্তরায় বা বাধা তাকেই মন্দরূপে গণ্য করেছে—দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য অতিরিক্ত কোন **উচ্চতর আদর্শের** প্রেক্ষিতে ভালমন্দের বিচার করেনি। তাহলে মানতে হয় যে, নীতিনিষ্ঠ যুগপ্রবর্তকদের উচ্চতর নৈতিক আদর্শের ভিত্তি সমাজ নয়, তা অন্যকিছু এবং সেই অন্যকিছু হল ধর্ম বা ধর্মের ঈশ্বর। ঈশ্বরকে এজন্য সমাজশক্তির প্রতীকরূপে গণ্য করা যাবে না।

(৪) দুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদে **ধর্মগুরুদের অনমনীয় বিবেকের ব্যাখ্যা হয় না।** অনেক ধর্মগুরু নিজেদের প্রত্যাদিষ্টরূপে গণ্য ক'রে এমন সব কর্ম করেন যা সমাজের ধ্যান-ধারণার বিরোধী। তবে সমাজের স্বার্থ-বিরোধী হলেও ধর্মগুরুকে ঐসব কাজ থেকে সমাজ নিবৃত্ত করতে পারে না। নিজের প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করেও অনমনীয় বিবেকের নির্দেশে ধর্মগুরু ঐ সব কর্মে নিজেকে নিয়োজিত না করে পারেন না। এখানে ধর্মগুরুর বক্তব্য হল, তাঁর কর্ম ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী অনুসারে কর্ম নয়, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অনুসারে কর্ম এবং সে কর্ম, তৎকালীন স্থবির সমাজের স্বার্থ-বিরোধী হলেও, তিনি সাধন করতে দায়বদ্ধ। দুরখেইমের বিরুদ্ধে

২. 'If the call of God is only society imposing upon its member's forms of conduct that are in the interest of that society, what is the origin of deligation to be concerned equally for all humanity ? Philosophy of Religion. J.H. Hick. P. 32.

অভিযোগ হল—এখানে ঈশ্বর যদি সমাজশক্তির প্রতীক হয় অর্থাৎ ঈশ্বর ও সমাজশক্তি যদি অভিন্ন হয়, তাহলে, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অনুসারে কর্ম সমাজের স্বার্থবিরোধী হতে পারে না। তাহলে এমন কথাই বলতে হয়—ঈশ্বর-শক্তি ও সমাজ শক্তি অভিন্ন নয়, তারা দুটি ভিন্ন শক্তি। অর্থাৎ ঈশ্বর-শক্তি যেমন সমাজ-শক্তির প্রতীক নয়, সমাজ-শক্তিও তেমনি ঈশ্বর-শক্তির প্রতীক নয়।

৭.১. (খ) ফ্রয়েড্-এর মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি (Freud's Psychological argument)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে গ্যালিলিও (Galileo), ডারউইন (Darwin) অথবা আইনস্টেইনের (Einstein) সমতুল্য এবং মনোসমীক্ষণের (Psychoanalysis) উদ্ভাবক সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড্ (Sigmund Freud 1856—1939) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে নিজ অভিমত উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসঙ্গে ফ্রয়েড্ তাঁর The Future of an illusion নামক গ্রন্থে বলেছেন, **'ধর্ম হল প্রাচীনতম, প্রবলতম এবং একান্তভাবে অসঙ্গত ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে সমগ্র মানবজাতির এক ভ্রান্তি—সর্বজনীন ভ্রান্তি।'**[১] ফ্রয়েডের মতে, ধর্ম হল এক মানসিক প্রতিরোধ—ভূমিকম্প, বন্যা, ঝঞ্ঝা, মহামারী, অবশ্যম্ভব মৃত্যু ইত্যাদি ভয়াবহ প্রাকৃতিক অবস্থা প্রসঙ্গে এক মানসিক প্রতিরোধ (mental defence), মানুষের কাছে যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা ও শক্তি নির্মম, নিষ্ঠুর ও অনমনীয়। কিন্তু মানুষ তার কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে ঐসব নৈর্ব্যক্তিক প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যক্তিসত্তায় বা ব্যক্তিক শক্তিতে (personal powers) রূপান্তরিত করে; এবং এভাবে নিষ্করুণ বহির্বিশ্বে ব্যক্তিক শক্তিরূপে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা ক'রে মানুষ তার অসহায় ও বিপন্ন-বোধকে প্রশমিত করে। The Future of an illusion গ্রন্থে ফ্রয়েড বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

'বন্যা, ঝঞ্ঝা, প্রভৃতি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি এবং মহামারী, মৃত্যু ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক ঘটনার কাছে কোন আবেদন করা চলে না, কেননা নৈর্ব্যক্তিক হওয়ায় সেসব মানুষের কাছে দুরধিগম্য। কিন্তু ঐ সব বিষয়ের যদি আমাদের মতো আবেগ, অনুভূতি, রাগ, দুঃখ ইত্যাদি থাকে অর্থাৎ সেসব যদি আমাদের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ হয়, তাহলে আমাদের অনেক আশঙ্কার উপশম হয়। যেমন, মৃত্যু যদি প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র না হয়ে কোন দুষ্ট আত্মার ইচ্ছা হয়, যদি প্রকৃতির সর্বত্রই মানব-সমাজের মতোই সচেতন পুরুষ থাকে, তাহলে আমাদের অনেক ভয় ও দুশ্চিন্তার উপশম বা অবসান হতে পারে, যেহেতু ঐসব সত্তাকে নানাভাবে অনুরোধ করে, তুষ্ট করে, উৎকোচ দিয়ে আমাদের জীবনের পথকে কিছুটা মসৃণ করা যেতে পারে। বাঁচার তাগিদে এভাবেই আদিম মানুষ প্রকৃতির মধ্যে মানবিক গুণসম্পন্ন চেতনসত্তার কল্পনা ক'রে তার তুষ্টিবিধানের প্রয়াস করে এবং সেই প্রয়াস থেকেই ধর্মের এবং ধর্মের ঈশ্বরের কল্পচিত্রটি রচিত হয়।'* অন্য একভাবেও ফ্রয়েড ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ফ্রয়েডের মতে, ধর্ম হল মানবমনের এক বিকার বা অসুস্থতা, মনোরোগ বিশেষ—উদ্বায়ু আবিষ্টতা (obsessional neurosis)। উদ্বায়ু আবিষ্ট ব্যক্তি তার প্রেম-পাত্রের (love-object) বিকল্পরূপে বা প্রতিনিধিরূপে ধর্মকে, ধর্মের ঈশ্বরকে গ্রহণ ক'রে ধর্মভাবে আছন্ন থাকে, যেখানে ধর্মের ঈশ্বর তারই কল্পনা-সৃষ্ট —নির্জ্ঞানের অবদমিত কামনা-বাসনার রচনা। ফ্রয়েড বলেন, উদ্বায়ু-আচ্ছন্ন মানসিক রোগী যেমন তার অবদমিত কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য এক বিকল্প প্রেম-পাত্র গঠন করে, ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনি মানুষ তার নিজের অতৃপ্ত কামজ বাসনার চরিতার্থতার জন্য ঈশ্বরকে—তার কল্পিত প্রেম-পাত্রকে গঠন ক'রে ধর্মভাবে আচ্ছন্ন থাকে।* ধর্ম তাই, ফ্রয়েডের মতে, এক মানসিক অসুস্থতার (mental illness) পরিচায়ক এবং প্রেম-পাত্রের প্রতিকল্পরূপে ধর্মের ঈশ্বর এক বিভ্রান্তি (illusion)। **ধর্মের ঈশ্বরের বস্তুগত সত্তা (objective reality) নেই, মায়া বা মোহ বা বিভ্রমে আচ্ছন্ন মানুষ ধর্মের ঈশ্বরকে রচনা করে, এবং অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছা প্রসঙ্গে ধর্ম এক মানসিক প্রতিরোধস্বরূপ** (mental defence)। **'ধর্ম হল মানবজাতির সর্বজনীন উদ্বায়ু আবিষ্টতা-বিশেষ।'**[২]

১. 'They (religious beliefs) are illusions, fulfillments of the oldest, strongest, and most inconsistent wishes of mankind.' The Future of an illusion. S. Freud. P. 229.

* Ibid.

* Freud and Religious belief. H.L. Philip. P. 28.

২. 'Religion is the universal obsessional neurosis of humanity'. The Future of an illusion. S. Freud. P. 44.

Totem and Taboo নামক গবেষণা গ্রন্থে ফ্রয়েড বলেছেন যে, **এই বিভ্রমের মূলে হল ব্যক্তির অথবা জাতির জীবনের শৈশবকালীন পিতৃ-প্রতীক** (symbol of father image)—সব ক্ষেত্রেই ধর্মের ঈশ্বর হল শৈশবের (তা ব্যক্তির হতে পারে, আবার জাতিরও হতে পারে) পিতৃ প্রতীকের প্রসারিত রূপ (enlarged form)। বিষয়টি প্রথমে (অ) ব্যক্তির শৈশবকালীন জীবন এবং পরে (আ) জাতির শৈশবকালীন জীবনের উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করা গেল—

(অ) মনোসমীক্ষক ফ্রয়েড, প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে বলেন, শিশুর জীবনেও 'কামজ-তৃষ্ণা'* (Sex-urge or Libido) থাকে এবং সেটাই তার জীবনের মূল চালিকা মানসিক- শক্তি (primary psychic energy)। শিশুর এপ্রকার যৌন তৃষ্ণা থেকে দুটি গুঢ়েষার (complex) উদ্ভব হয়—**ইদিপাস্ গুঢ়েষা** (Oedipus complex) ও **ইলেক্ট্রা গুঢ়েষা** (Electra complex)। এই গুঢ়েষা প্রাক্-লৈঙ্গিক পর্যায়ে (pre-genital stage) এক সর্বজনীন গুঢ়েষা। মানসিক এই জটিলতার (complex) ফলে, এই পর্যায়ে, পুং-শিশু মাতার প্রতি যৌনতাড়না বশত প্রেম-ভালবাসা এবং পিতার প্রতি বিদ্বেষ বশত বিতৃষ্ণা অনুভব করে ; এবং বিপরীতক্রমে, স্ত্রী-শিশু পিতার প্রতি যৌনতাড়না বশত প্রেম ভালবাসা এবং মাতার প্রতি বিদ্বেষ বশত বিতৃষ্ণা অনুভব করে। এই গুঢ়েষা প্রকৃতপক্ষে শিশুর অবচেতনে এক সুতীব্র অন্ধ আবেগ এবং নির্জ্ঞানের (unconscious) ঐ অন্ধ ও বর্বর আবেগের অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে পুং-শিশু তার কামনার বস্তু মাতাকে সম্পূর্ণ করে ভোগ করার জন্য তার পিতাকে গ্রাস (= হত্যা) করে, অর্থাৎ নিজেকে পিতার সঙ্গে একাত্ম করে ভাবে যে, পিতার স্থলে কেবল সেই আছে—পিতার কামজ সম্ভোগে তারই সম্ভোগ হয়। একইভাবে, স্ত্রী-শিশু তার কামনার বস্তু পিতাকে সম্পূর্ণ করে ভোগ করার জন্য তার মাতাকে গ্রাস (=হত্যা) করে অর্থাৎ মাতার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ভাবে যে, মাতার স্থলে কেবল সেই আছে—মাতার কামজ সম্ভোগে তারই সম্ভোগ হয়। তবে, এই স্তরে পুং-শিশুর পিতার প্রতি এবং স্ত্রী-শিশুর মাতার প্রতি কেবল বিদ্বেষ-মিশ্রিত মনোভাবই থাকে না, সেই সঙ্গে ভালবাসা মিশ্রিত শ্রদ্ধাও থাকে। শৈশবকালে পুং-স্ত্রী নির্বিশেষে সব শিশুই অনুভব করে যে, তাদের সেই একান্ত দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় হল তাদের পিতা-মাতা। এই স্তরে শিশুর মনে তাই পিতা-মাতার প্রতি **উভয়মুখী মনোভাব** (ambivalance—উভয়বলতা)—ভয় ও ভালবাসা, ঘৃণা ও শ্রদ্ধার মনোভাব দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মতে, শৈশবকালীন শিশুর অবচেতনে এই পিতৃ-প্রতীকই** পরবর্তীকালে, যথাসম্ভব প্রসারিত আকারে, ঈশ্বরের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। **ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তাই, ফ্রয়েডের মতে, ব্যক্তির শৈশবকালীন ইদিপাস গুঢ়েষারই স্মারক** (relic of childhood Oedipus complex)। শিশুর অবচেতনে পিতার (এবং মাতারও) মূর্ত (concrete) চিত্রটি প্রসারিত করে পরবর্তীকালে মানুষ বিমূর্ত (abstract) ঈশ্বরের চিত্রটি রচনা করে এবং একইভাবে মনে করে যে, জগৎপিতা-স্বরূপ ঈশ্বর দুর্বল ও অসহায় মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান করেন, জীবনযুদ্ধে মানুষকে জয়ী হতে সাহায্য করেন। ধর্মের ঈশ্বর তাই কোন বাস্তব সত্তা নয়, তা হল নিছক প্রতীক—শৈশবকালীন শিশু-মনের পিতৃপ্রতীক (God is nothing but infantile father image)।

(আ) ডারউইনের (Darwin) জীবজগতের বিবর্তনবাদ অনুসরণ করেও ফ্রয়েড ধর্মের উৎপত্তি ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুসরণ করে ফ্রয়েড প্রাগৈতিহাসিক কালের এমন সব আদিম মানুষের উল্লেখ করেন যখন আদিম মানুষ ছোট ছোট দল গঠন করে বসবাস করে এবং যেসব দলের দলপতি-পিতা (father of the primal horde) হল সর্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান ও বলবান। দলপতি তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে যতসংখ্যক সম্ভব স্ত্রী সংগ্রহ ক'রে দল গঠন করে এবং অপেক্ষাকৃত হীনবল পুরুষদের অযাচারের (incest) আশঙ্কায়, ঐ দল থেকে বিতাড়িত করে। বহু-স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রসন্তানদেরও তাদের যৌবন সমাগমে, একই অযাচারের আশঙ্কায়, দলপতি দল থেকে বিতাড়িত করে।

* উল্লেখ্য যে, ফ্রয়েড 'কাম' (Sex) শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে যে-কোন দৈহিক সুখকে কামজসুখ বলেছেন।

** ফ্রয়েড 'পিতৃ-প্রতীক' শব্দটিকে পিতা ও মাতা উভয়েরই প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু এভাবে দলপতি-পিতা দীর্ঘদিন বধূ-নারী সম্ভোগ করতে পারে না, কেননা বিতাড়িত সন্তানদল কোন এক সময়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দলপতি-পিতাকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করে এবং জীঘাংসা বশত সমবেতভাবে গোষ্ঠীপতির মেদ-মজ্জা-মাংস ভক্ষণ করে ও রুধির পান করে (যেহেতু সেইসময়ে মানুষ নরখাদক ছিল), এবং অবশেষে, পিতৃহত্যাজনিত অপরাধবোধে, সমবেতভাবে বিলাপ ও ক্রন্দন করে। এভাবে পিতার রুধির পান করে ও মেদ-মজ্জা-মাংস ভক্ষণ করে সন্তানগণও নিজেদের পিতৃশক্তিতে বলীয়ানরূপ গণ্য করে ও মৃত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে একইভাবে দল গঠন করে এবং একইকারণে তাদের পুত্রসন্তানদেরও, তাদের যৌবন সমাগমে, দল থেকে বিতাড়িত করে। বিতাড়িত পুত্রসন্তানগণও একইভাবে কোন একসময়ে দলবদ্ধভাবে তাদের পিতাকে হত্যা ক'রে একইভাবে দল গঠন করে। এভাবেই চলে আদিম মানুষের পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীজীবন। এরপর, সমাজ পরিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে, অপেক্ষাকৃত উন্নত বোধশক্তিসম্পন্ন বিতাড়িত সন্তানগণ দলপতি-পিতাকে আক্রমণকালে উপলব্ধি করে যে, দলপতি-পিতাকে হত্যা ক'রে পূর্ব-পদ্ধতি অনুসরণ করে দল গঠন করলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে—তাদের সন্তানগণও একদিন তাদের হত্যা করবে। আবার, আদিম মানুষের জীবনে (যাদের জীবন শিশুর জীবনের সঙ্গে তুলনীয়) রাগ ও ক্ষোভের প্রকাশ না হয়েও পারে না। এমন অবস্থায় বিতাড়িত সন্তানদল, পিতার-পরিবর্তরূপে, সম্মুখস্থ কোন পশুকে হত্যা ক'রে (ক্ষেত্র বিশেষে কোন বৃক্ষকে ছেদন ক'রে) তার মেদ-মজ্জা-মাংস-রুধির ভক্ষণ করে এবং হত্যাজনিত বিলাপ ও ক্রন্দন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ দলভুক্ত মানুষ, পশুর ঐ জাতটিকে (species) পিতৃ-প্রতীকরূপে গণ্য করে এবং আরও মনে করে যে, কোন এক বিস্মৃত সুদূর অতীতে ঐ পশুই তাদের পূর্বপুরুষদের জন্মদান করেছে, অর্থাৎ পশুটি তাদের আদিম পিতৃপুরুষ। এই মনোভাববশত, আদিম মানুষ ভয়-বিস্ময়-শ্রদ্ধা-মিশ্রিত মনোভাবসহ ঐ জাতিভুক্ত পশুকে আরাধনা করে, উপাসনা করে, পূজার্চনা করে। এভাবেই মানুষের সমাজে ধর্মের উৎপত্তি হয়, যেখানে ধর্মের ঈশ্বর এক নিছক প্রতীকমাত্র—আদিম মানবসমাজের বিতাড়িত সন্তানদল কর্তৃক রচিত পিতৃ-প্রতীক। ফ্রয়েডের মতে, ধর্মের জগতে মানুষ আজও আদিম মানুষের সেই কল্পিত ধারণা—পিতৃ-প্রতীকরূপে ঈশ্বরের ধারণা—বহন করে চলেছে।

তাহলে, ফ্রয়েডের মতে, 'অবাস্তব ঈশ্বর-প্রকল্পটি আসলে ব্যক্তির অথবা জাতির অবদমিত ইচ্ছার, প্রতীকী আকারে, এক ক্ষতিপূরণ প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মানুষ তৃপ্তিলাভ করে।'[১] সহজ কথায়, ফ্রয়েডের মতে, নির্জ্ঞানই (unconscious) ঈশ্বর-প্রকল্পের এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের উৎসমূল। উল্লেখ্য যে, ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারী কিন্তু ফ্রয়েডের সমালোচক মনোসমীক্ষক য়্যুঙ্গ-ও (Jung) ধর্মের ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে এক অতি-কল্পনা বা অবাস্তব কল্পনারূপে (fantacy) গণ্য করে বলেন, ঈশ্বরের ধারণাটি নেহাৎই পাত্রগত, ব্যক্তিমন-নির্ভর (subjective idea) যার অনুরূপ কোন বাস্তব বিষয় নেই। ধর্ম এক মানসিক বিকার—উদ্বায়ু আবিষ্টতাজনিত রোগ-বিশেষ, যদিও এই বিকার সার্বত্রিক বা সর্বজনীন। 'ধর্ম হল প্রাচীনতম, প্রবলতম এবং সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে সমগ্র মানবজাতির এক ভ্রান্তি।'[২]

সমালোচনা (*Criticism*)

ফ্রয়েডের বিপ্লবাত্মক মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ মনোবিজ্ঞানের জগতে নতুন নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, একথা স্বীকার করেও বলতে হয় যে, ধর্ম সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। আপত্তি হল—

(১) 'ডারউইন (Darwin) ও রবার্টসন্ স্মিথকে (Robertson Smith) অনুসরণ করে ফ্রয়েড যে আদিম মানব গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, সাম্প্রতিককালের নৃতাত্ত্বিকগণ তাকে সঠিক বলেননি ; এবং ফ্রয়েড উল্লিখিত ইদিপাস্ গুঢ়েষা (Oedipus complex) প্রসঙ্গেও আধুনিককালের মনোবিদগণ সহমত পোষণ করেন না।'[৩]

১. 'The God myth is nothing but the repressed wishes of the race finding compensation in symbolic form.' Philosophy of Religion. Miall Edwards. P. 233.

২. The Future of an illusion. S. Freud. P. 229.

৩. Philosophy of Religion. J. H. Hick. P. 34.

(২) ধর্ম যদি বিভ্রম (illusion) হয়, তাহলে প্রশ্ন হল, আদিমকাল থেকে, মানব-সভ্যতার সূচনাকাল থেকে, এযাবৎ মানুষ এমন এক ভ্রান্তিকে পোষণ করে চলেছে কেন? এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রয়েড ধর্মকে 'ভ্রান্তি'রূপে চিহ্নিত করার পরেও মানুষ ধর্মকে পরিত্যাগ করে না কেন? ফ্রয়েডের অভিমতের উল্লেখ করেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যায় :

'ধর্ম বিভ্রম বা ভ্রান্তি হলেও তা বিশেষ কোন দেশ-কালের বিশেষ কোন মানুষের বিভ্রম নয়, তা হল সব দেশ-কালের সব মানুষের বিভ্রম—সার্বত্রিক বিভ্রম (universal illusion)। **সার্বত্রিক বিভ্রমের বিষয়কে পাত্রগত (subjective) বলা চলে না, সার্বত্রিক বিভ্রমের বিষয়কে ব্যক্তিমন-নিরপেক্ষরূপে মানতে হয়।** তাহলে, ধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ঈশ্বরকে বিষয়গতরূপে (objective) মানতে হয়।

(৩) মানুষের সহজাত প্রবণতার (instinct) কোন না কোন বিষয় থাকে। যেমন, খাদ্যান্বেষণ প্রবণতার বিষয় খাদ্যবস্তু। ঈশ্বর-বাসনাও মানুষের কাছে এক প্রবণতা-বিশেষ, যা আদিমকাল থেকে অদ্যাবধি মানুষকে তার কাম্যবস্তু লাভের জন্য ব্যাকুল করে তোলে। অনেকের মতে, যথা—প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক বোসাঙ্কের (Bosanquet) মতে, **এ প্রকার ধর্মীয় প্রবণতাই নির্দেশ করে যে, ধর্ম মিথ্যা বা বিভ্রান্তি নয়, ধর্মের ঈশ্বর অতি-কল্পনা (myth) নয়।** ভিত্তিহীন খেয়ালী কামনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, মানুষ তার তিক্ত অভিজ্ঞতার (ব্যর্থতার) ওপর নির্ভর করে অচিরেই সেই কামনাটিকে পরিত্যাগ করে। যেমন, 'আকাশের চাঁদকে খেলনারূপে হাতের মুঠোয় পাওয়া',—মানবশিশুর এই ইচ্ছা বা কামনাটি দীর্ঘদিন থাকে না, শিশু ক্রমশই উপলব্ধি করে যে, তার এই ইচ্ছাটি নেহাৎই খেয়ালী ইচ্ছা। ধর্মীয় বাসনা এমন নয়, সভ্যতার উষাকাল থেকে আজও মানুষ কামনাটিকে পোষণ করে চলেছে, পরিত্যাগ করেনি। এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মানুষের ধর্মীয় বাসনার বিষয় ঈশ্বর আছেন। এ প্রসঙ্গে বোসাঙ্কে বলেন, 'ক্ষুধার তাড়না যেমন খাদ্যবস্তুর অস্তিত্বকে নির্দেশ করে, তেমনি ঠিক একইভাবে সহজ-প্রবণতারূপে ঈশ্বর-বাসনা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে।'[১]

(৪) একথা ঠিক যে, ধর্মের অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর আছেন অথবা নেই তা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় না। তবে, সত্য/মিথ্যা নির্ধারণের অপর এক পথ আছে—উপযোগবাদসম্মত বা হিতবাদসম্মত পথ (pragmatic way of verification)। উপযোগবাদ বা হিতবাদ অনুসারে, জীবনে যা উপযোগী তা সত্য, যা অনুপযোগী তা মিথ্যা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে, ধর্মের ঈশ্বরকে, মিথ্যা বলা যায় না। সমাজজীবনে, মানুষের জীবনে, ধর্মের উপযোগিতাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা চলে না।

তবে, উপযোগিতার উল্লেখ করেও ধর্মের সারবত্তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, কেননা প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি যে ধর্মযুদ্ধ মানব-ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে চলেছে, তার ওপর নির্ভর করে ধর্মের অনুপযোগিতাই বিশেষ করে প্রকটিত হয়। তাহলে উপযোগিতার উল্লেখ করে ধর্মকে যেমন মিথ্যা বা বিভ্রম বলা চলে না, তেমনি আবার সত্য বলাও যায় না। অর্থাৎ ধর্ম সম্পর্কে ফ্রয়েডের অভিমতকে অসঙ্কোচে গ্রহণযোগ্যরূপে গণ্য করা চলে না।'*

৭.১. (গ) [ধর্ম সম্পর্কে] : আধুনিক বিজ্ঞানের আপত্তি বা অভিযোগ**

(*The challenge of Modern Science*)

বিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের অথবা ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের আপোষহীন দ্বন্দ্ব। ধর্ম ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ভিন্ন, তাদের আলোচনা পদ্ধতি ভিন্ন। ধর্ম নির্বিচারে কোন পূর্বস্বীকৃতিকে

১. 'The instinctive appetite or demand for God.....is a proof of the reality of Deity, in the same sort of sense in which hunger is a proof of the existence of food. Contemporary Philosophy. Bosanquet. P. 67

Quotation taken from. The Philosophy of Religion. M. Edwards. P. 238.

* Ibid. P. 35.

** বিষয়টি J.H. Hick-এর Philosophy of Religion অনুসরণ করে লিখিত।

তাহলে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস/অবিশ্বাস প্রসঙ্গে সমগ্র আলোচনাটির পরিশেষে শেষ সিদ্ধান্ত হল, যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না যে ঈশ্বর আছেন, তেমনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না যে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক ধর্মীয় যুক্তিগুলি (arguments for the existence of God) যেমন, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ হলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধন করতে পারে না, বিজ্ঞানের সম্প্রসারিত কিন্তু সীমায়িত জ্ঞানও তেমনি সুনিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সাধন করতে পারে না।

৭.১. (ঘ) চার্বাকের যুক্তি (*Cārvākas' argument*)

চার্বাক প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদী, অর্থাৎ চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষজনিত যে অপরোক্ষ ও সম্যক অনুভব, তাই হল প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ আবার দ্বিবিধ—বাহ্যপ্রত্যক্ষ ও মানসপ্রত্যক্ষ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের জগতের যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ তা বাহ্যপ্রত্যক্ষ। মনের সাহায্যে সুখদুঃখাদি মানসিক অবস্থার অপরোক্ষ অনুভব হল মানস প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রমাণই (যথার্থ জ্ঞানের উপায়কে 'প্রমাণ' বলে) একমাত্র প্রমাণ। অনুমান প্রত্যক্ষ-নির্ভর হওয়ায় তা প্রমাণ নয়। আগম বা শব্দ অনুমান নির্ভর এবং ফলত প্রত্যক্ষ-নির্ভর হওয়ায় তা প্রমাণ নয়। সকল প্রমাণের মূল প্রমাণরূপে প্রত্যক্ষই তাই একমাত্র প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাক নাস্তিক (বেদ-প্রামাণ্য বিরোধী) ও জড়বাদী। নাস্তিকরূপে চার্বাক ঘোরতর বেদবিরোধী এবং বেদ নিন্দুক। জড়বাদীরূপে চার্বাক অধ্যাত্মবাদের তীব্র বিরোধী। চার্বাকমতে, জগতের অন্তিম উপাদান হল জড় এবং জড় থেকেই জড়ের 'স্বভাব নিয়মে' জগতের উৎপত্তি। অতীন্দ্রিয় অ-জড় বলে জগতে কিছুই নেই। দেহাতিরিক্ত আত্মা নেই ; কর্মফল, পরলোক, পুনর্জন্ম, প্রভৃতি নেই ; ঈশ্বর নেই ; পাপ নেই, পুণ্য নেই ; পাপ-পুণ্যের কর্মফলভোগও নেই। অপ্রত্যক্ষগোচর অতি-প্রাকৃত কিছুই নেই। দেহের মৃত্যুর পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আছে কেবল জড় (চতুর্ভূত) এবং তার পরমাণু।—**এপ্রকার অভিমতের পৃষ্ঠপোষক চার্বাকের কাছে ঈশ্বর অসিদ্ধ।**

নিম্নোক্ত যুক্তি দর্শিয়ে চার্বাক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন ঃ

(১) **ঈশ্বরকে পরমাত্মারূপে গণ্য করা হয়, কিন্তু চার্বাক মতে জড়দেহ অতিরিক্তভাবে আত্মা নেই।** জড়ই একমাত্র সদ্বস্তু। তবে দেহ অতিরিক্তভাবে আত্মা না মানলেও চার্বাক আত্মা অস্বীকার করেন না। অধ্যাত্মবাদীরা 'আত্মা' বলতে যে অ-জড় সত্তার উল্লেখ করেন, চার্বাক তাকেই অস্বীকার করেন। **চার্বাক মতে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা।** দেহ অতিরিক্তভাবে স্বতন্ত্র আত্মা নেই, কেননা তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। জড়-দেহ আছে, কেননা দেহ প্রত্যক্ষ করা যায়। চৈতন্যও আছে, কেননা অন্তঃপ্রত্যক্ষে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয়। এই চৈতন্য, চার্বাক মতে, কোন অতীন্দ্রিয় আত্মার ধর্ম নয়। চৈতন্য হল প্রত্যক্ষ গোচর দেহেরই ধর্ম। **সজীব দেহই আত্মা এবং চৈতন্য দেহেরই ধর্ম।** ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুতের কণা দ্বারা গঠিত হল দেহ। এই চারটি জড় উপাদানের **বিশেষ সংমিশ্রণের** ফলে যে দেহ, তাতে চৈতন্যরূপ এক নতুন গুণের উন্মেষ হয়। যদিও চতুর্ভূতের কোনটিতেও চৈতন্য নেই, চতুর্ভূতের **বিশেষ বিন্যাস** বা সংমিশ্রণে যে দেহ তাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। সার কথা হল, **চার্বাক মতে, জড়-অতিরিক্তভাবে আত্মা বলে কিছু নেই। পরমাত্মারূপে ঈশ্বর তাই অসিদ্ধ।** প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাকের কাছে 'পরমাত্মারূপী অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর আছেন', এমন কথা বিকারগ্রস্ত উন্মাদের প্রলাপমাত্র।

(২) ঈশ্বরবাদীরা জগতের **আদি কারণরূপে,** জগতের **সৃজনকর্তারূপে,** ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কার্য থাকলে তার কারণ থাকে, অথবা বলা যায়, কার্য থাকলে তার সৃজনকর্তা থাকে। জড়-জগতের উপাদানসমূহ নিজে নিজে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। জড় উপাদান সহযোগে কিছু উৎপন্ন হতে গেলে একজন চেতনকর্তার প্রয়োজন হয়। মৃত্তিকা নিজে নিজে ঘটে পরিণত হয় না। মৃত্তিকার সাহায্যে কুম্ভকার

ঘট তৈরি করে। তন্তু নিজে নিজে বস্ত্রে পরিণত হয় না। তন্তুবায় তন্তুর সাহায্যে বস্ত্র তৈরি করে। অনুরূপ, অংশ সমন্বিত সাবয়ব বস্তুমাত্রই কার্য। ঘট পটের (বস্ত্রের) মতো জগৎও তাই কার্য, কেননা জগৎ অংশসমন্বিত সাবয়ব বস্তু। জগৎ, ঘট পটের মতো, কার্য হলে তারও কারণ বা সৃজনকর্তা থাকবে। ঈশ্বরবাদীদের মতে, ঈশ্বরই জগতের কারণ, জগতের সৃষ্টিকর্তা।

প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাক জগতের কারণ বা কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কারণ, প্রত্যক্ষ যখন একমাত্র প্রমাণ তখন ঈশ্বর অসিদ্ধ। ঘটের বা পটের সৃজনকর্তারূপে যেমন কুম্ভকার ও তাঁতিকে প্রত্যক্ষ করা যায়, জগতের সৃজনকর্তারূপে তেমন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

তাছাড়া, চার্বাক বলেন, **কার্যমাত্রেরই যে বিশেষ কারণ থাকবে এমন নয়। কার্য-কারণ সম্বন্ধ,** চার্বাক মতে, **অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ নয়, তা হল আপতিক বা সম্ভাব্য।** যাকে আমরা 'কার্য' বলি এবং যাকে আমরা 'কারণ' বলি, এমন দুটি ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। কাজেই জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সচেতন ক্রিয়াশীল ঈশ্বর-স্বীকৃতির (যেমন—কুম্ভকার, তাঁতি ইত্যাদি) প্রয়োজন হয় না। **ভূত-পদার্থসমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি বা 'স্বভাবের' দ্বারাই জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।** চার্বাক মতে, **স্বভাব নিয়মই জগতের, জগদ্‌বৈচিত্র্যের একমাত্র নিয়ামক।** চার্বাক বলেন, 'স্বভাবঃ পদার্থানাং স্বভাবাদেব জগদ্‌বৈচিত্র্যমুৎপদ্যাতে। স্বভাবতো বিলয়ং যাতি প্রতিনিয়তশক্তিঃ। স্বভাবো জগতঃ কারণম্। স্বভাবঃ এব হেতুঃ। স্বাভাবিকং জগদিদম্।'[1] অর্থাৎ পদার্থ সমূহের স্বভাব থেকেই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়। স্বভাবনিয়মেই ভূতচতুষ্টয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পরমাণু থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি। স্বভাবনিয়মেই জড় থেকে বৈচিত্র্যময় জগতের তথা চৈতন্যের উদ্ভব। মৃৎ পদার্থের স্বভাবের জন্য মৃত্তিকা থেকে ঘটাদি উৎপন্ন হয় : তন্তু পদার্থের স্বভাবের জন্য তন্তু থেকে পটাদি উৎপন্ন হয়। **দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা কার্যের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা গেলে অদৃষ্ট ঈশ্বর অথবা কারণ শক্তির স্বীকৃতি অনাবশ্যক।** চার্বাক বলেন, 'দৃষ্ট মাতা-পিতার কামবৃত্তি থেকেই প্রাণীদের উৎপত্তি' এমন ব্যাখ্যাই সঙ্গত—ঈশ্বরের বা অন্য কোন অপ্রত্যক্ষগোচর কারণের কল্পনা এক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

সহজ কথায়, চার্বাক মতে **বস্তুর স্বভাবই তার গতি ও প্রকৃতির কারণ।** অগ্নির উষ্ণতা, কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, ইক্ষুর মধুরতা, নিম্বের (নিমপাতার) তিক্ততা, জলের শীতলতা ইত্যাদি কার্য কর্তা-সাপেক্ষ বা কারণ-সাপেক্ষ নয়। বস্তু তার স্বভাব নিয়মে নিজ নিজ ধর্ম পায়। গ্রহ-নক্ষত্র, নদী, পাহাড়-পর্বত—জগতের সকল কিছুই চতুর্ভূতের স্বভাব-নিয়মে উৎপন্ন হয় এবং তাদের নিজ নিজ ধর্ম বা গুণ লাভ করে। চতুর্ভূত তাদের নিজ নিজ স্বভাববশেই পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এই বৈচিত্র্যময় জগতের উদ্ভব ঘটিয়েছে, আবার স্বভাববশেই চতুর্ভূত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জগতের বিনাশ ঘটাবে।

চরমপন্থী চার্বাক আবার স্বভাববাদের পরিবর্তে যদৃচ্ছাবাদের উল্লেখ করে স্বভাবের কারণতাকে অস্বীকার করে বলেন, জগতের বৈচিত্র্যসৃষ্টি যদৃচ্ছিক (mere chance), **আকস্মিক** (accidental) ও **অহেতুক** (uncaused)। অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতা, রাজহংসের শুক্লতা, ময়ূরের বিচিত্রতা ইত্যাদি জাগতিক সকল কিছুই কর্তাবিহীন, কারণবিহীন, স্বভাব- নিয়মবিহীন, এবং সবই যদৃচ্ছিক, আকস্মিক, অহেতুক। বস্তুর উৎপত্তি আকস্মিক, স্থিতি আকস্মিক, বিলুপ্তিও আকস্মিক—চতুর্ভূত লক্ষ্যহীনভাবে যদৃচ্ছাভাবে এবং সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে জগতের উৎপত্তি ঘটিয়েছে।

স্বভাববাদী বা যদৃচ্ছাবাদী চার্বাকের সার কথা হল জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিরর্থক—**কষ্ট-কল্পিত ঈশ্বর-প্রকল্পটি পরিত্যাগ ক'রে, সহজভাবেই বস্তুস্বভাবের অথবা আকস্মিকতার উল্লেখ করে জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা সম্ভব।**

(৩) ঈশ্বরবাদীদের অনেকেই, যথা—ন্যায়-বৈশেষিক, **কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের** উল্লেখ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন। এই জগতে মানুষের অবস্থার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই সংসারের কেউ সুখী আবার কেউ দুঃখী, কেউ ধনী আবার কেউ নির্ধন, কেউ স্বাস্থ্যবান আবার কেউ রুগ্ন, কেউ পণ্ডিত আবার কেউ

১. চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। পৃ: ১১১।

মূর্খ। এই সংসারে আরও দেখা যায়, ধার্মিক ব্যক্তি প্রায়শই দুঃখভোগ করে এবং অধার্মিক ব্যক্তি সুখভোগ করে। এই বৈষম্যের অবশ্যই কোন কারণ আছে। ঈশ্বরবাদী ন্যায়-বৈশেষিক মতে, এমন বৈষম্যের মূলে হল কর্মনীতি বা কর্মবাদ (Law of Karma)। বাহ্যজগতের কার্য-কারণ নিয়মকেই নৈতিক জগতে প্রয়োগ করে তাকে কর্মনীতি বা কর্ম-নিয়ম বলা হয়েছে। বাহ্যজগতে যেমন কার্যমাত্রই কারণজন্য, নৈতিক জগতেও তেমনি মানুষের সুখ দুঃখভোগ (কর্মফল অর্থাৎ কার্য) কর্মজনিত। অলঙ্ঘনীয় কর্মনিয়ম অনুসারে, কর্মমাত্রই তার ফল প্রসব করে। ভালকর্ম ভাল ফল এবং মন্দকর্ম মন্দফল প্রসব করে—সে ফলভোগ এজীবনে হতে পারে আবার পরজীবনেও হতে পারে। অর্থাৎ অলঙ্ঘ্য কর্মনিয়ম অনুসারে, কর্মফলভোগ এজীবনে না হলেও তা ব্যর্থ হয় না, তা **অদৃষ্টশক্তিরূপে** ব্যক্তির জীবনে সঞ্চিত থাকে, এবং সেই অদৃষ্টশক্তি অনুসারে পরজীবনে ব্যক্তি সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। কর্মবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে, এজন্য ঈশ্বরবাদী ন্যায়-বৈশেষিক পরজন্মকে, পুনর্জন্মকেও স্বীকার করেন।

তবে, ন্যায় বৈশেষিক বলেন, নিছক অদৃষ্টশক্তির দ্বারা জীবের সুখ-দুঃখভোগ নির্ধারিত হতে পারে না, কেননা তা এক অন্ধ অচেতনশক্তি। 'কোন্ জীবের কর্মফল প্রাপ্তি কেমন হবে'—এমন বিচার অন্ধ অদৃষ্টশক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই অদৃষ্টের নিয়ন্তা বা পরিচালকরূপে এক চেতনকর্তার (পুরুষ বা আত্মার) অনুমান করতে হয়, যিনি সর্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী ও সর্বক্ষম এবং যিনি জীবের পাপ পুণ্যের বিচার করে সেইমতো তাদের ফলদানের ব্যবস্থা করেন। এই সর্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী ও সর্বক্ষম পুরুষই হল ঈশ্বর।

চার্বাক দর্শনে এসবই অস্বীকৃত—কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ অস্বীকৃত। চার্বাক মতে, কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্বন্ধ অব্যভিচারী নয়, তা সব্যভিচারী। কারণ ও কার্য দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা, বিশেষ কোন কারণ থেকে বিশেষ কোন কার্য ঘটবেই, এমন নয়। কাজেই, চার্বাক মতে, কর্ম (কারণ) ও কর্মফলের (কার্যের) মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। কর্মবাদ এক অসার কল্পনা-বিলাসমাত্র। **মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ কোন কর্মফল নয়—সুখ দুঃখ কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়, নির্ভরশীল মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর এবং মানুষের পরিণামদর্শিতার ওপর।** এই জগতে সবই আকস্মিক। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখও আকস্মিক। একইরকম কর্মের জন্য একজনের সুখভোগ এবং অন্যজনের দুঃখভোগ হতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করে, পরিণামের কথা চিন্তা করে, সতর্কতা অবলম্বন করে, বিচার বুদ্ধির দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করলে সুখলাভ হয়, অন্যথায় দুঃখ পেতে হয়। কাজেই, সুখ-দুঃখ মানুষের কর্মের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার পরিণামদর্শিতার ওপর।

কর্মবাদ স্বীকার না করলে পুনর্জন্মবাদ স্বীকারেরও প্রয়োজন হয় না। চার্বাক এজন্য পরজন্ম পুনর্জন্ম ইত্যাদিকেও উন্মাদের প্রলাপরূপে গণ্য করেন। দেহ-অতিরিক্তভাবে যখন আত্মা বলে কিছু নেই, তখন দেহ ভস্মীভূত হলে চতুর্ভূত ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এবং ফলত পূর্বজীবনের কর্ম অনুসারে পরজীবনে ফলদানের জন্য ঈশ্বর স্বীকৃতিরও প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ।

(৪) ঈশ্বরবাদীরা, বিশেষত ন্যায়-বৈশেষিকগণ, **বেদ-প্রামাণ্যের উল্লেখ করে** ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন। ন্যায় মতে, বেদ-প্রামাণ্যের ভিত্তি হল বেদকর্তার বা বেদ-রচয়িতার প্রামাণ্য অর্থাৎ আপ্ত-প্রামাণ্য। আপ্তব্যক্তির বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, কেননা আপ্তের লক্ষণ হচ্ছে ভ্রম-প্রমাদ-প্রবঞ্চনাশূন্য। আমরা সাধারণত রচয়িতার প্রামাণ্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর রচনাকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করি। যেমন, চিকিৎসাবিদের প্রামাণ্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করি। বিজ্ঞানীর প্রামাণ্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করি। একইভাবে, আমরা বেদকর্তাকে সর্বজ্ঞরূপে মনে করে তার রচিত বেদবাক্যকে প্রামাণ্য মনে করি।

এখানে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন হল—বেদের রচয়িতা কে? চিকিৎসাশাস্ত্রের রচয়িতা চিকিৎসাবিদ, বিজ্ঞানের রচয়িতা বিজ্ঞানী,—বেদের রচয়িতা কে? সাধারণ মানুষ বেদরচয়িতা হতে পারে না, কেননা তারা ভ্রম-প্রমাদ-প্রবঞ্চনাযুক্ত। কিন্তু বেদবাক্য প্রামাণ্য ও অভ্রান্তরূপে স্বীকৃত। তাছাড়া বেদে এমন অনেক অতীন্দ্রিয় ও অপার্থিব বিষয়ের উল্লেখ আছে যা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারে না। কাজেই, বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমান করতে হয় যে, এমন এক সর্বজ্ঞ পুরুষ আছেন যিনি ত্রৈকালিক বস্তু ও ঘটনার,

সসীম-অসীম, পার্থিব-অপার্থিব, বাস্তব-সম্ভাব্য, সমুদয় বস্তু ও ঘটনার সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। এই পুরুষ বা আত্মাই ঈশ্বর। ঈশ্বরবাদীরা বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। চার্বাক উপরোক্ত অভিমত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। চার্বাক মতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ নয়। শব্দ প্রমাণ নয়। শব্দ 'প্রমাণ' অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে না হলে বেদবাক্যকে (বাক্য শব্দসমষ্টি) প্রমাণ বলা চলে না। বেদবাক্যের প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে চার্বাকের যুক্তি হল—

(i) **বেদ অপৌরুষেয়** (সাধারণ পুরুষের যথা, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়, এমন) নয়। 'বেদশাখার' নাম থেকেই বেদকর্তার নাম পাওয়া যায়'।[১] যেমন, 'কাঠক' নামক ব্যক্তি রচিত গ্রন্থ হল 'কঠ', 'পিপ্পলাদ' নামক ব্যক্তি রচিত গ্রন্থ হল 'পৈপ্পলাদ', 'কুথুম' নামক ব্যক্তি রচিত গ্রন্থ হল 'কৌথুম'। 'কঠ, পিপ্পলাদ, কুথুম প্রভৃতি ব্যক্তিই বেদের রচয়িতা বা কর্তা'।[২] অনেকে আবার ব্যাসদেবকে (বেদব্যাস) বেদ-রচয়িতা বলেন। কাজেই বেদ অপৌরুষেয়। এর বিরুদ্ধে চার্বাকের অভিমত হল, **কোন কিছুর স্রষ্টাকে স্মরণে আনতে না পারলে প্রমাণিত হয় না যে সেই বস্তুটি পুরুষ-সৃষ্ট নয়।** প্রাচীনকালের অনেক কূপ, পুষ্করিণী, মন্দির প্রভৃতির স্রষ্টাকে আমরা স্মরণ করতে পারি না। এতে প্রমাণিত হয় না যে, ঐসব কূপ, মন্দির প্রভৃতি কোন পুরুষ সৃষ্ট নয় এবং তারা নিত্য। একইভাবে বেদও অপৌরুষেয় ও নিত্য নয়। বেদ সৃষ্ট এবং অনিত্য। অনিত্য বস্তুমাত্রই দোষদুষ্ট। 'কাজেই বেদকে, বেদবাক্যকে, প্রমাণ বলা চলে না।

(ii) বেদকে যারা অপৌরুষেয় বলেন তাঁদের যুক্তি হল—বেদস্রষ্টাকে আমরা স্মরণ করতে পারি না।

(iii) ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর (অর্থাৎ রাক্ষস) এই তিন প্রকার লোক মিলিত হয়ে বেদ-রচনা করেছে। বেদে নানা প্রকার যাগ-যজ্ঞের উপদেশ ভণ্ড রচিত, স্বর্গ নরকাদির চিত্র ধূর্ত-অঙ্কিত এবং মদ মাংস ভক্ষণ-বিধি রাক্ষস কল্পিত। ধূর্ত ও ভণ্ড ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞ সরলমতি জনসাধারণকে প্রতারিত ক'রে নিজেদের জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বেদ রচনা করেছে। বেদ-বিহিত কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরই লাভ হয়, যজমানের কোন লাভ হয় না। ধূর্ত ও প্রবঞ্চক পুরোহিত সরলমতি যজমানকে পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নির্দেশ দেন। যজ্ঞান্তে পুত্র জন্মালে পুরোহিত নিজের মহিমা প্রচার করেন, পুত্র না জন্মালে যজ্ঞের ত্রুটির উল্লেখ করেন। বেদ-নির্দেশিত অগ্নিহোত্র হোম, বেদ অধ্যয়ন, দণ্ডাধারণ, ভস্মলেপন ইত্যাদি, চার্বাক মতে, দুর্বুদ্ধি, পৌরুষহীন ব্যক্তিদের ভণ্ডামিমাত্র। চতুর ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিজে বেদকে প্রামাণ্য মনে করেন না, কিন্তু যজমানকে তা বিশ্বাস করতে বলেন। বেদে বলা আছে—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশুবলি দিলে সেই পশুর স্বর্গলাভ হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত একথা সত্য মনে করলে যজ্ঞে পশুবলির পরিবর্তে তাঁর অতি-বৃদ্ধ মাতা- পিতাকেই যজ্ঞে বলিদান করবে, বাস্তবত যা তিনি করেন না। পুরোহিত জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞকে অসার জেনেও, নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য, স্বল্পবুদ্ধি মানুষকে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করেন।

(iv) বেদ উদার রুচিসম্পন্ন কোন পুরুষের সৃষ্টি নয়। বেদে এমন কিছু উক্তি আছে যার কিছু অর্থহীন, আবার কিছু অশ্লীল। বেদে 'সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু', 'ইন্দ্র সোমস্য কাণুকা' ইত্যাদি কতকগুলি মন্ত্র আছে যাদের অর্থ অবিজ্ঞেয় বা যার কোন অর্থই হয় না।[৩] আবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনেক মন্ত্র এত অশ্লীল যে, কোন রুচিবান ব্যক্তি তা পাঠ করতে ঘৃণা বোধ করে। বেদে বর্ণিত দেবতাদের অনেকেই চরিত্রহীন। বেদজ্ঞ ঋষিদের অনেকেই দুশ্চরিত্র। বেদ-রচয়িতা ব্যাসদেব দুশ্চরিত্র, লম্পট ও পাশুবদের চাটুকার ছিলেন। বেদে গো-জাতিকে মনুষ্য-জাতি অপেক্ষা উচ্চতর বলা হয়েছে। যে শাস্ত্রে গরুকে মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর বলা হয়, সেই শাস্ত্রে কোন রুচিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির শ্রদ্ধা থাকতে পারে না। মানব প্রকৃতি তিন প্রকার—পুং প্রকৃতি, স্ত্রী প্রকৃতি ও নপুংসক। একমাত্র নপুংসক, যে কাম সাধনে অক্ষম, সেই কেবল বেদে বিশ্বাস করে।

বেদ প্রসঙ্গে উপরোক্ত প্রকারে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে চার্বাক বলেন যে, **বেদের উল্লেখ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় না। ঈশ্বর অসিদ্ধ।**

১. চার্বাক দর্শন। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী পৃ: ৮৪।
২. ঐ।
৩. পূর্ববৎ পৃ: ৮৪।

চার্বাক ঘোরতর নিরীশ্বরবাদী। প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী চার্বাকের কাছে যা অতীন্দ্রিয় তা অসৎ। ঈশ্বর-প্রকল্প ভণ্ড ও ধূর্তদের জীবিকা অর্জনের জন্য এক কপট চিত্র। মূর্খরাই এই প্রকল্পে বিশ্বাস করে, বুদ্ধিমান ঈশ্বর মানেন না। **প্রত্যক্ষসিদ্ধ দেশের রাজাকেই চার্বাক ঈশ্বর বলেন।** কাল্পনিক ঈশ্বরে অর্পিত অনেক গুণ রাজার মধ্যে থাকে, তাই রাজাই ঈশ্বর। দেশের রাজা সর্বাপেক্ষা শক্তিমান পুরুষ। রাজা প্রজাপালক, ন্যায়-বিচারক। রাজা প্রজার সুখ-শান্তি বিধান করেন। রাজাকে তুষ্ট করলে প্রজা সুখ-শান্তি লাভ করে অর্থাৎ স্বর্গসুখ পায়। রাজাকে অসন্তুষ্ট করলে প্রজার অনেক দুর্গতি হয়। মূর্খেরা স্তব-স্তুতি ক'রে বৃথাই অলীক ঈশ্বরকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে। বুদ্ধিমানেরা দেশের রাজাকে তুষ্ট ক'রে রাজানুগ্রহে ঐশ্বর্যসুখ ও ভোগসুখ লাভ করে। 'লোকোসিদ্ধো ভবেৎ রাজা'। রাজা বাস্তব সত্য, প্রত্যক্ষের বিষয়। রাজাই ঈশ্বর।

মূল্যায়ন (*Evaluation*)

'ঈশ্বর অসিদ্ধ'—প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাকের এই অভিমত সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে, প্রত্যক্ষই হল সকল প্রমাণের মূল প্রমাণ—অনুমান, শব্দ, উপমান ইত্যাদি সব প্রমাণই প্রত্যক্ষ নির্ভর। কাজেই, যা অপ্রত্যক্ষগোচর তাকে চূড়ান্ত অর্থে 'আছে', বলা যায় না। ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক যুক্তিগুলির দ্বারা—বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি, উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি, নৈতিক যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা ঈশ্বরবাদীদের ঈশ্বর-বিশ্বাস সুদৃঢ় করা গেলেও জড়বাদীদের কাছে তাদের কোন মূল্য নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের এমন অনেক কিছুর, যেমন—ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যা অপ্রত্যক্ষের বিষয়। এমন স্বীকার করার পশ্চাতে বিজ্ঞানের যুক্তি হল, ন্যায়-ভিত্তিক যুক্তি (logical argument)। ন্যায়যুক্তি দুরকম হতে পারে—আরোহমূলক (Inductive) ও অবরোহমূলক (Deductive)। আরোহমূলক যুক্তির সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত নয়, সম্ভাব্য। অবরোহমূলক যুক্তির সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত। বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় অবরোহযুক্তি প্রয়োগ করে, যেখানে **একটি সামান্য বচন** (universal proposition) থেকে বিশেষ বচন এমনভাবে নিষ্কাশন করা হয় যা সত্য না হয়ে মিথ্যা হতে পারে না। উল্লেখযোগ্য যে, ন্যায়শাস্ত্রে বা যুক্তিশাস্ত্রে (Logic) সামান্য বচনমাত্রই 'যদি-তাহলে' শর্তযুক্ত প্রাকল্পিক বচন, যার বাস্তব সত্যতা প্রসঙ্গে কিছুই বলা হয় না। এখানে, বিজ্ঞানের যুক্তি-প্রমাণের আকারটি হল—

যদি প তাহলে ফ,
প
∴ ফ।

যদি (অপ্রত্যক্ষগোচর) ইলেকট্রন প্রোটন থাকে তাহলে ক, খ, গ, ঘ, ঘটনা ঘটবে,
ইলেকট্রন প্রোটন আছে,
∴ ক, খ, গ, ঘ ঘটনা ঘটে। (এবং বাস্তবিক ক, খ, গ, ঘ ঘটনা ঘটে)।

ঈশ্বরবাদীরা এমন যুক্তি প্রয়োগ করে বলতে পারেন না—
"যদি ঈশ্বর থাকেন তাহলে 'অমুক অমুক ঘটনা' ঘটবে"।

'অমুক অমুক ঘটনা' যে কী, ঈশ্বরবাদীরা সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলতে পারেন না। কাজেই বলা চলে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করা গেলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন কোনভাবেই সম্ভব হয় না।

৭.১. (ঙ) বৌদ্ধদের যুক্তি (*Buddhistic argument*)

জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকরূপে বৌদ্ধরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কয়েকটি ঈশ্বরবাদী আস্তিক দর্শনে বেদকে অভ্রান্তরূপে গণ্য করা হয়েছে, যেহেতু বেদের রচয়িতা হলেন ঈশ্বর। সর্ব-ঐশ্বর্যবান ও অনন্তজ্ঞানী ঈশ্বরের রচনা কখনো দোষযুক্ত বা ভ্রান্ত হতে পারে না। ঈশ্বর আত্মকল্প, অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর। জীবাত্মার জ্ঞান সসীম ও অনিত্য। পরমাত্মা ঈশ্বরের জ্ঞান অসীম ও নিত্য। জীবাত্মা অল্পক্ষম, ঈশ্বর সর্বক্ষম। জীবাত্মার, অভাব বশত, কামনা আছে ; ঈশ্বরের কামনার কিছু নেই, তিনি আপ্তকাম। জীবাত্মার জ্ঞান দোষদুষ্ট, ঈশ্বরের জ্ঞান নির্দোষ। জীবাত্মার জ্ঞান